বরো বাগদিনী

(গল্পগ্রন্থ – নীলগঞ্জের ফালমন্ সাহেব)

ওর নাম ‘বরো’ এর মানে বলতে পারব না। সবাই ডাকে বরো বাগদিনী বলে। একটু মোটাসোটা, কুচকুচে কালো, আঁটসাঁট গড়নের, বয়েসে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে।

এই পাড়াতেই বামুনবাড়ি বরো কাজ করতো, বাইরের কাজ, কারণ বাগদিনীর হাতের জলে কোনো কাজ হবে না। গোয়াল গোবর করা অর্থাৎ গোয়াল পরিষ্কার করাই ছিল তার প্রধান কাজ। বিচুলি কেটে গরুকে জাবও দিত। উঠোন ঝাঁটও দিত।

একদিন শুনলাম, বরো মুখুজ্যেবাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েচে। মুখুজ্যে মশাই নিজেই এসে আমার কাছে নালিশ করলেন। বললেন—তুমি তো পল্লীমঙ্গলের সেক্রেটারি, এর একটা বিহিত করো—

—কি ব্যাপার হয়েচে কাকা?

—সেই বরো বিটি আজ কোথাও কিছু না, কাজে এল না আমার বাড়িতে। এক হাঁটু হয়ে রয়েছে গোয়াল, থইথই করচে উঠোন আর বিটি কিনা স্বচ্ছন্দে বললে আমি কাজ করবো না। ছোটলোকের এত বড় আস্পদ্দা আর সহ্যি হয় না।বলি যাই দিকি বিভূতির কাছে, একটা বিহিত এর করো দিকি বাবা।

—কাজ ছাড়লো কেন হঠাৎ, তা কিছু জানেন?

—কি করে জানবো বাবা, কাল বললে আমার তামাক-পোড়া খাওয়ার পয়সা আলাদা দিতে হবে। তাই বললাম, তিন টাকা করে মাইনে আবার তার ওপর তামাক-পোড়া খাওয়ার পয়সা! পারবো না। তাই বাবা—

—এর কি করা যাবে পল্লীমঙ্গল থেকে বলুন? আপনার পয়সা-কড়ি নিয়ে সে তো আর চলে যায়নি! আমি কি করবো বলুন কাকা—আমার দ্বারা কিছু হবে না।

—তা হবে কেন? তা কি আর হবে? ছাইভস্ম কি সব মাথামুণ্ডু লিখতেই শিখেচো। গাঁয়ের কোন্ উপ্গার কি তোমায় দিয়ে হবে বাবা—তা হবে না। সে বুঝতে পেরেছি অনেকদিন—

মুখুজ্যে কাকা অপ্রসন্ন মুখে চলে গেলেন। কি করবো—আমি নাচার। পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারি তো আর নবাব-নাজিম খান্জা খাঁ নয় যে, যাকে-তাকে ধরে নিয়ে এসে যে কোনো অপরাধে গর্দান নেবো! আমি কি করতে পারি বরো বাগদিনীর?

হঠাৎ বরোর সঙ্গে একদিন গোপালনগরের পথে দেখা।

একটা ভাঙা চুপড়ি কাঁখে সে বাজারে যাচ্ছে, পরনে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র।

বললাম—কি বরো? ভালো আছ?

বরো থমকে রাস্তার এক পাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল জড়সড় হয়ে, আমায় পথ দেবার জন্যে, যদিও তার কোনো প্রয়োজন ছিল না, পথ দু’জনের পক্ষে যথেষ্ট চওড়া। বললে—বাবু আমাকে কাট দেবেন একখানা?

—কাট? কি কাট?

—বাবু, সেই রেশম কাট।

—বুঝলাম। তোমার নেই?

—না বাবু, কে এনে দেবে, মোদের কথা কি কেউ শোনে? কাপড় নেই, এই দেখুন এই কাপড়খানা—

বরো আঁচলের অংশটুকু আমার সামনে মেলে ধরলে। বললাম—থাক থাক ও দেখাতে হবে না, দেখেই বুঝতে পাচ্চি।

কথাটি তখনি মনে পড়ে গেল।

বললাম—আচ্ছা মুখুজ্যেবাড়ির কাজটা ছেড়ে দিলে কেন হঠাৎ? মুখুজ্যে কাকা সেদিন বলছিলেন—

বরো আমার পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করে বললে—সে বাবু আর আপনার সামনে বলবো না।

একটু এগিয়ে গিয়ে পেছন ফিরে আমার দিকে চেয়ে বললে—ওনার মতিগতি ভালো না বাবু, এই একটা কথা আপনাকে বললাম—

বরো চলে গেল।

ব্যাপার কি?

মুখুজ্যে কাকা কি বরো বাগদিনীর কাছে প্রেম করতে গিয়েছিলেন? উভয়ের এই বয়সে? বিশ্বাস তো হয় না। মরুকগে, পরের কথায় দরকার কি আমার!

পৌষমাসের প্রথমেই ভীষণ শীত পড়লো।

একদিন রাত দশটার পর ওপাড়ার হাজারি ঘোষের বাড়ি থেকে ভাগবতের কথকতা শুনে ফিরচি—এমন সময় পায়ে-চলা মাটির পথের ধারে একখানা কুঁড়েঘরের দাওয়ায় কে শুয়ে আছে দেখে সেখানে থমকে দাঁড়ালাম।

এ পাড়ায় আমার যাতায়াত খুবই কম। তার ওপর বহুকাল গ্রামে না থাকার দরুন কোন্‌টা কার বাড়ি চিনিনে। এগিয়ে গিয়ে বললাম—শুয়ে কে?

—কে, বাবু? আসুন? কনে গিয়েলেন এত রাত্তিরি? আমি বরো।

—ও, এই তোমার বাড়ি নাকি?

—হ্যাঁ বাবু। এরে কি আর বাড়ি বলে? ওই কোনোরকমে আছি মাথা গুঁজে। গরিব নোকের আবার বাড়ি আর ঘর। আপনিও যেমন।

সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। কেউ বললে বিশ্বাস করবে না, ছোট্ট একখানা চার-চালা ঘর, ঘরের পিছনদিকে দেওয়াল নেই, কঞ্চির বেড়া বা চাঁচ কিছুই নেই—একেবারে ফাঁকা, সামনের যে দাওয়ায় বরো বাগদিনী এতক্ষণ শুয়ে ছিল তার দুদিকে নোনার পাতার বেড়া কিন্তু সামনের দিকে একদম ফাঁকা। এই ভীষণ শীতে এই খোলা দাওয়ায় কি একখানা গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। ঘরের মধ্যেও যেন কে শুয়ে আছে মেঝেতে। বললাম—ঘরে ও কে?

—ও মোর ছেলে ট্যানো। ওরে চেনেন না?

—না, তোমার ছেলে আছে তাই জানিনে! কত বড়?

—তা বাবু শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে বড়সড় হয়েছে। কত তা কি মোরা জানি? এই পাড়ার রাখাল, সবারই গরু চরায়।

—বেশ।

এইবার আমার নজর পড়লো বরো যেখানা গায়ে দিয়েছিল সেই কাপড়খানার দিকে। থলের চট বলেই মনে হওয়াতে জিগ্যেস করলাম—গায়ে দিয়েছ কি ওটা?

—এখানা বাবু কম্বল।

—কি রকম কম্বল ?

—আর বছর বনগাঁ থেকে এনে ডাক্তারবাবু বিলি করলেন। এর মধ্যে তুলো পোরা। পাঁচখানা মোদের গাঁয়ে বিলি হয়েল, গোরমেন্ট থেকে নাকি বিলি হয়েল। কি জানি বাবু, আপনারাই জানেন—মোরা কি খবর রাখি বলুন। দিলে একখানা, নেলাম। তা বাবু একখানা কাপড় পাবো না? মুছলবে বেরোবার উপায় নেই—

গ্রামের লোকে কি করে জীবন কাটায় ভালো করে দেখিনি কোনোদিন, আজ একে দেখে তা বুঝলাম। এই শীতে একখানা থলের চট গায়ে দিয়ে বাইরে শুয়ে যে আছে, তার কালই নিমোনিয়া যদি হয় এ বছরের এই ভীষণ শীতে, তবে কোন ডাক্তারখানা থেকে এদের ওষুধ আসবে?

দিনকতক পরে গ্রামে বাঘের উপদ্রব হল। প্রতি বৎসরই শীতকালে বাঘের উপদ্রব হয় এ অঞ্চলে। লোকের গোয়াল থেকে গরুবাছুর নেয়, রাত্রিচরা গরু তার পরের দিনের আলো হয়তো আর দেখে না। এ বছর উপদ্রবটার বাড়াবাড়ি দেখা গেল। দিনদুপুরে দক্ষিণ মাঠের বেগুনের ক্ষেতে কি নয়ালি দীঘির পাড়ের জঙ্গলে চুয়োডাঙ্গার রাস্তার অশ্বত্থ গাছের তলায় বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখে চাষি কি পথ চলতি লোকে। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে ইছামতীর ধারের বাঁশবনের পথ দিয়ে সীতে জেলে মাছ ধরে নিয়ে তেঁতুলতলার ঘাট থেকে বাড়ি ফিরচে, মস্ত বড় বাঘ (অবিশ্যি সীতে জেলের বর্ণনানুসারে) রাস্তা জুড়ে শুয়ে আছে। জনপ্রাণী নেই তেঁতুলতলার ঘাটের পথে, বাঘও নড়ে না—সীতে জেলের ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা—তারপর বাঘটা হঠাৎ লাফ দিয়ে পাশের ঝোপে কেন পালিয়ে গেল সে-ই জানে। একদিন তো আমারই বাড়ির পেছনে বাঁশবনে সন্ধ্যারাতে কেউ ডাকতে শুরু করলো। হাট থেকে ফিরবার পথে বরো বাগদিনীর ঘরের পাশ দিয়ে এলাম ওকে বাঘের কথাটা বলে সতর্ক করে দেবার জন্যে।

জ্যোৎস্না উঠেছে সন্ধ্যার অল্প পরেই, তেমনি শীত।

বরো দেখি দাওয়ায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে একটু করে ঘুঁটের আগুন। একেবারে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

—কি বরো, এত সকালে শুয়ে পড়েচ?

—বাবু! আসুন, বড্ড জ্বর এয়েল দুপুরবেলা। আজ আর হাটে যেতে পারিনি। চটখানা মুড়ি দিয়ে পড়ে আছি।

—তোমাকে এলাম একবার সাবধান করে দিতে। বাইরে এরকম শোয়া ঠিক না। কাল তো আমার বাড়ির পেছনের বাগানে বাঘ ডেকেছে। তোমার ঘর আরো বনের মধ্যে—

—বাবু, কিছু হবে না। বাঘে মোদের কি করবে? ও ভয় নেই মোদের। তা থাকলি কি আর বারোমাস এই ফাঁকা জায়গায় শুতি পারি? ও মোদের সয়ে গিয়েচে। ভয়ডর থাকলি কি মোদের চলে?

একদিন পরের কথা।

সকালবেলা হইহই ব্যাপার। সবাই ছুটচে ওপাড়ার দিকে।

বরো বাগদিনীকে নাকি শেষরাতে বাঘে মেরেচে। সঠিক খবর কেউ দিতে পারে না।

ব্যাপার কি দেখবার জন্য ছুটলাম ওপাড়ার দিকে।

গিয়ে দেখি বরো বাগদিনীর ঘরের উঠোন লোকে লোকারণ্য। বরো বাগদিনীর গলা সকলকে ছাপিয়ে উঠেছে। সে হাত-পা নেড়ে কি একটা বর্ণনা করচে সকলের সামনে। আর সেই জনমণ্ডলীর মাঝখানে বরো বাগদিনীর দাওয়ার ঠিক সামনের উঠানে একটা বড় গুল-বাঘ মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বরো বাগদিনী নাকি বাঘটাকে গত শেষরাতে কাস্তে বঁটি দিয়ে মেরেচে।

জিগ্যেস করলাম—কাস্তে বঁটি দিয়ে অতবড় বাঘটাকে—?

তখন বরো আবার আমার দিকে ফিরে তার কাহিনী গোড়া থেকে শুরু করলে। সত্যিই সে বাঘটা মেরেচে এবং বঁটি দিয়ে মেরেচে। শেষরাত্রে বাঘটা ওর ঘরের পেছনে এসে হাঁক পাড়ে। বরোর ছেলে ঘর থেকে ভয়ে চিৎকার করে উঠতেই বরোর ঘুম ভেঙে যায়। ছেলেকে বাঘে ধরেচে ভেবে ও দাওয়ার কোণ থেকে কাস্তে বঁটি নিয়ে বাঘের ঘাড়ে পড়ে। বাঘ আসলে তখন ধরেচে ওদের সেই ধাড়ি ছাগলটাকে। অন্ধকারে দেখাই যাচ্ছে না

বাঘে ছাগল ধরেচে না ছেলে ধরেচে। কাস্তে বঁটি দিয়ে বাঘের ঘাড়ে মরিয়া হয়ে নির্ঘাত ঘা কতক কোপ দিতে বাঘ সেখানেই ঘাড় কাত করে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়—এই হল বরো বাগদিনীর বর্ণনা।

ভিড়ের মধ্যে মুখুজ্যে কাকা ছিলেন, তিনি বললেন—তোর একটুও ভয় করলো না সামনে যেতে ? বরো বললে—মোর কি তখন জ্ঞান ছেল, দাদাঠাকুর? মোর আজ দু'দিন জ্বর। ওই উনি (আমার দিকে আঙুল দিয়ে) পরশু দেখে গিয়েলেন। বাঘ হ্যাঁকোর হ্যাঁকোর করে উঠলো, তাও শোনলাম জ্বরের ঘোরে—মোর ছেলে চিৎকার করে উঠলো, তাও শোনলাম। জ্বরের ঘোরে ভাবলাম মোর ছেলেটাকে বাঘে ধরেচে, তখুনি কাস্তে বঁটি কোণ থেকে তুলে নিয়ে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়িছি—মোর তখন জ্ঞানগম্যি নেই—ছেলেকে বাঘে খাবে আর মুই বসে দ্যাখবো? মোর পেরাণ যায় আর থাকে—বাঘ আসলে মোর ওই ধাড়ি ছাগলডা ধরেচে তখন—মুই কি অন্ধকারে চকি দেখতি পাচ্ছি কিছু? মুই ভাবলাম মোর খোকারে ধরেচে—

ক্রমে ভিড় আরো বাড়তে লাগলো দেখে আসবার উপক্রম করচি এমন সময় বরো বললে—বাবু, একটা কথা। মোর কাপড় একেবারে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে বাঘের সঙ্গে হুড়যুদ্ধ করতি। এ পরে আছি কলুবাড়ির মনোদিদির থানখানা। সকালে এট্টু চেয়ে এনেছে মোর ছেলে গিয়ে। মোর সে কাপড় তো নক্ত-মাখা নোনাতলায় পড়ে রয়েছে, ওই দেখুন—ও আর পরা যাবে না। তা বাবু, রেশম কার্ডখানা মোরে দিয়ে একখানা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দ্যান আপনি—এ পরের কাপড়, ওরা আজই চেয়ে নিয়ে যাবে এখন—মুছলবে বেরুতি পারবো না বস্তর বিনে—

মুখুজ্যে কাকাও আমার দিকে চেয়ে অনুনয়ের সুরে বললেন—দাও বাবাজি, ওর রেশম কার্ডখানা দেওয়ার ব্যবস্থা করো, আর যাতে একখানা কাপড় ওকে আজই দিতে পারো—ওর মোটেই কাপড় নেই—যাতে হয় বাবাজি—তুমি মনে করলেই হবে—

মুখুজ্যে কাকা আমার হাতদুটো ধরেন আর কি!